ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ ও শান্তি

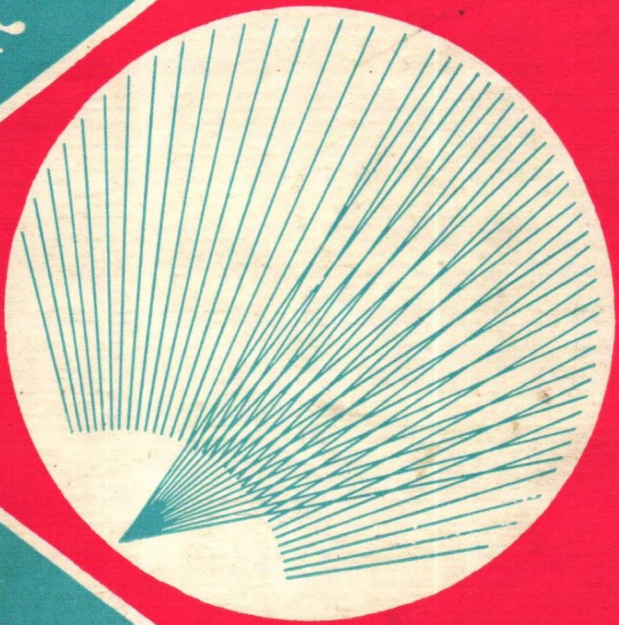

ডঃ খলিফা আবদুল হাকিম

www.pathagar.com

ডঃ খলীফা আবদুল হাকিম

ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ ও শান্তি

সাইয়্যিদ আবদুল হাই

অনূদিত

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ ও শান্তি
ডঃ খলীফা আবদুল হাকিম
অনুবাদ ঃ সাইয়েদ আবদুল হাই

ইসাকেডা প্রকাশনা ঃ ৩৪
ইফা প্রকাশনা ঃ ৪২০

প্রকাশক ঃ
অধ্যাপক এ, এস, এম. ওমর আলী
সহকারী পরিচালক
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা বিভাগ
বায়তুল মুকাররম (তেতলা), ঢাকা-২

প্রথম সংস্করণ ঃ মে ১৯৮০
জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ ঃ রজব ১৪০০

প্রচ্ছদ ঃ মামুন কায়সার চৌধুরী

মুদ্রক ঃ
অধ্যাপিকা দিলারা বাহার
কথাচিত্রণ
৫/২২, টেকের হাট লেন,
ঢাকা-১

মূল্য ঃ দুই টাকা মাত্র

ISLAMER DRISHTITEY SHANTI O JUDDHO
Written by DR. KHALIFA ABDUL HAKIM
Translated by SYED ABDUL HAI and
Published by Islamic Cultural Centre
Dacca Division, Dacca-2
Islamic Foundation, Bangladesh.
Price : Taka Two Only

www.pathagar.com

আমাদের কথা

ইসলাম বলপ্রয়োগে প্রচারিত হয়েছিল অথবা ইসলাম নৃশংসতার ধর্ম. এ ধরনের মিথ্যা প্রচার করা কোন কোন ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীর একটা পেশা ও নেশায় পরিণত হয়েছে। অথচ এ-কথা ইতিহাসের যে কোন নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেরই জানা আছে যে, ইসলাম শান্তিকে সর্বাধিক মূল্য দিয়েছে এবং ইসলাম সবসময়ই অকারণে রক্তপাত ও বল-প্রয়োগের ঘোরবিরোধী। যে কোন যুদ্ধাভিযানের প্রাক্কালে ইসলামের খলীফাগণ নিরীহ লোকজন হত্যা ও সম্পদ ধ্বংসের বিরুদ্ধে কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণ করতেন, তাও সবার জানা।

"ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ ও শান্তি" শীর্ষক পুস্তিকায় বিখ্যাত মনিষী মরহুম ডক্টর খলীফা আবদুল হাকীম ইসলামের যুদ্ধ ও শান্তি নীতিই ব্যাখ্যা করেন নি, তার দার্শনিক ভিত্তিও নিপুণ-ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা-র পক্ষ থেকে এই গুরুত্বপুর্ণ পুস্তিকার নতুন সংস্করণ বের করতে পেরে আমরা রহমানুর-রহীমের দরগায় লাখো শুকরিয়া জানাচ্ছি।

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঢাকা/২৯-৫-৮০

আবদুল গফুর
আবাসিক পরিচালক

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ ও শান্তি

ইসলাম শান্তির ধর্ম। তবুও একে আত্মরক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। এর ফলে জোর জবরদস্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত ও তলোয়ারের সাহায্যে প্রচারিত ধর্ম বলে ইসলামের নামে কুৎসা রটনা করা হয়েছে। যাঁরা কারলাইলের মত ভবিষ্যত দ্রষ্টার অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে অথবা গিবন ও তার পরবর্তী অনেকের মত ধর্মীয় গোড়ামী ত্যাগ করে ইসলামের উত্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন তারা সহজেই এই অভিযোগ খণ্ডন করতে পারেন।

ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ছিলেন এমন একজন মহাপুরুষ যিনি সামাজিক, আর্থিক বা রাজনৈতিক কোন পার্থিব শক্তির অধিকারী ছিলেন না। তিনি যখন নিজেকে ও তাঁর মুষ্টিমেয় অনুসারীকে প্রাচীনকালের দলীয় বর্বরতা থেকে রক্ষা করার জন্য শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন, তার আগে প্রায় দশ বৎসরেরও বেশী তিনি ও তাঁর অনুসারীরা সমস্ত রকম সম্ভাব্য উপায়ে নির্যাতিত হয়েছেন। তিনি ও তাঁর অনুসারীরা অনেক বড় বড় অসুবিধার মধ্যেও অসাধারণ ধৈর্য ও অধ্যাবসায় দেখিয়েছেন। তাঁরা সমস্ত পার্থিব বস্তু থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। নিজেদের জীবিকা নির্বাহ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাদেরকে নির্বাসিত করা হয়েছে এবং তাদেরকে নিজেদের আবাসভূমি থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। ইতিহাসের আন্দোলনই ইসলামের চেয়ে বেশী ত্যাগ ও কোন শাহাদতের স্পৃহা দেখাতে পারে নি। এমন কি যখন তাঁরা মনে করেন যে প্রতিঘাত করার জন্যে তাঁরা যথেষ্ট শক্তিশালী, তার বহুকাল পর পর্যন্তও রসুলুল্লাহ্ হযরত মুহম্মদ (সাঃ) তাদেরকে প্রতিঘাত করতে নিরস্ত করেছেন।

www.pathagar.com

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এমন এক সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন যখন তিনি ও তাঁর অনুসারীরা সবচেয়ে কম রক্তপাতের মধ্য দিয়ে তাদের কাজে জয়লাভ করবেন। তাঁরা শুধু নিজেদের ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও সাধারণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট ছিলেন। এই ধর্মীয় স্বাধীনতায় প্রত্যেকেই নিজেদের বিশ্বাসমত কাজ করতে পারবে, কিন্তু একটা শান্তিময় সমাজ-ব্যবস্থার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন ভঙ্গ করতে পারবে না। রসুলুল্লাহ্ যদি তাঁর পেছনে বিরাট সৈন্য-বাহিনী নিয়ে তাঁর মতবাদ প্রচার করতে আরম্ভ করতেন এবং জনসাধারণকে ধর্ম পরিবর্তনের কিংবা তলোয়ারের আঘাতের প্রস্তাব করতেন, তাহলে অবশ্য এটা সঠিকভাবেই মন্তব্য করা যেত যে, এমন একটি ধর্মমত যা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। ইসলাম ধর্মের মূলনীতি হচ্ছে 'ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি করা উচিত না'; আল-কুরআন, একথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। অতএব ইসলাম কখনই জোর করে লোককে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারে না।

সোজা প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, কোথা থেকে এই তলোয়ার ব্যবহারকারী লোকগুলো এসেছিল? যদি তলোয়ারই লোককে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে থাকে, তাহলে ঐ তলোয়ার ব্যবহারকারী লোকগুলোকে কে ইসলামে দীক্ষিত করেছিল? রসুলুল্লাহ্‌র যখন সত্যতা ও দৃঢ়-বিশ্বাসের শক্তি ছাড়া অন্য কোন শক্তি ছিল না, তখন তার বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর শক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে একে একে তার সমস্ত নির্যাতনকারীরা বশীভূত হয়ে পড়ে। ইসলাম গ্রহণের পর পূর্বের এই নির্যাতনকারীরা ও নূতন ধর্মান্তরিতরা অন্যদের দ্বারা নির্যাতিত হতে লাগল। তারা যে নৃশংসতা ভোগ করেছিলেন তার ভয়ানক দৃশ্য বর্ণনা করা অপ্রয়োজনীয়। প্রায় দশ বৎসরেরও বেশী সময় ইসলাম একেবারেই শক্তিহীন ছিল। আস্তে আস্তে এই বিশ্বস্ত লোকের সংখ্যা বেড়ে যায় কিন্তু নির্যাতন চলতেই থাকে এবং তারা নির্বাসিত হন। তখন এমন এক সময় এলো যখন তাদের

www.pathagar.com

সামনে তাঁদের ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করা অথবা ধ্বংস হয়ে যাওয়া কেবলমাত্র এ দুটো পথই খোলা ছিল। ইসলাম যদি নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য যুদ্ধ করেই থাকে, তাহলে কি কেউ তাকে দোষী করতে পারেন ?

জীবনে যুদ্ধের স্থান কি, তা সঠিকভাবে বুঝার পথে বড় অন্তরায় এসেছে এই থেকে যে ইসলামের পূর্বে সুসভ্য মানবজাতির এক বৃহৎ অংশে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম ও খৃস্টান ধর্ম অন্ততঃ মতবাদের দিক থেকে যুদ্ধ বা কোন কারণে হত্যা করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল। শুধু মানুষের জীবন নষ্ট করা থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয়, এমন কি পোকা-মাকড়, জীবাণু ও বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত হত্যা করাও পাপ বলে মনে করা হত। সমস্ত নৈতিকতা ও ধার্মিকতার পরম উদ্দেশ্য হলো শান্তি এবং অনন্তিষ্টতা, কিন্তু বৌদ্ধ, জৈন ও খৃস্টান ধর্মের মত ধর্মগুলি এই উদ্দেশ্যকে ভুল বুঝেছে। বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসা বা হত্যা না করার মতবাদ ছিল অবাস্তব। সমস্ত জীবনই অন্য জীবনের ভক্ষক; উচ্চতরের পক্ষে নিম্নতরকে ভক্ষণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। যেমন রুমী বলেছেন, "দুনিয়ায় প্রত্যেক জিনিসই ভক্ষক ও একই সময়ে ভক্ষিত।" প্রজননের ইচ্ছা সহ সমস্ত আকাঙ্খার অস্বীকৃতি দিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম জীবনেরই অস্বীকৃতি ঘোষণা করেছে। অহিংসার এই নীতি সঠিক ভাবে অনুসরণ করলে শুধুমাত্র মানুষই নয়, এমন কি সমস্ত অস্তিত্বকে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। আজও ভারতে এমন কতকগুলি ধর্মীয় গোষ্ঠী আছে যার অনুসারীরা কাপড় দিয়ে তাদের মুখ ঢেকে রাখে, যাতে করে দৃশ্য অদৃশ্য কোন কীট-পতঙ্গ বা জীবাণু মুখে প্রবেশ করতে পারে না। বেচারারা জানে না দিনে-রাত্রে কত জীবন্ত সত্তাকে এরা অজ্ঞাতসারে ধ্বংস করে চলেছে। তারা জীবাণু, উকুন, পোকা-মাকড়, বৃশ্চিক, মশক এবং সমস্ত অন্যান্য কীট-পতঙ্গ হত্যা পাপ বলে মনে করে। এ হলো বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের অহিংস নীতির সংগে তাল মিলিয়ে চলার একটা প্রচেষ্টা। এ সমস্ত ভ্রান্ত লোকগুলি বুঝতে পারে না যে উদ্ভিদেরও জীবন আছে এবং জীবজন্তু আহার ত্যাগ করে, ফলমূল ও

www.pathagar.com

তরিতরকারী খেয়ে বেঁচে থাকার অর্থ হলো শুধুমাত্র একধাপ নীচেরই জীবনকে ধ্বংস করা। এমন মতবাদে মানুষ কোন যৌক্তিক সামাজিক শৃঙ্খলা পেতে পারে না। সে বাঁচতেই পারে না।

তারপর খৃস্টান ধর্ম ও বাইবেলে আসা যাক। প্রথম যুগের খৃস্টানরা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করত যে যীশু-খৃস্ট সব অবস্থাতেই যুদ্ধ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। ন্যায় ও অন্যায় যুদ্ধ এবং আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে কোন পার্থক্য করা হত না। "নূতন ব্যবস্থাতে" সমস্ত যুদ্ধের উপরই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল। বিশ্বাস করা হত যে যীশু খৃস্ট যেকোন রকমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন, মন্দের কোন প্রতিরোধ ছিল না, মন্দের প্রতিদান দিতে হত ভাল দিয়ে। প্রকৃত খৃস্টানদের জন্য একমাত্র সঠিক পথ ছিল, জুলুমবাজদের বিরুদ্ধে 'প্রভু'কে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দিয়ে শান্তভাবে ও ধৈর্য ধরে আত্মবলি দেওয়া। যেকোন অবস্থাতেই জোরজবরদস্তি করে মন্দের দমন করা যীশু খৃস্টের নিষেধ ছিল, একথা যীশুর শিক্ষার এক অপব্যাখ্যা। মানব-সমাজের সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রেম ও অহিংসা নীতির মূল্য অনেক, এবং যীশু এদের উপর সঠিকভাবেই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু এই একই যীশু টাকা লগ্নীদারদেরকে গির্জা প্রাঙ্গণে চাবুক মেরেছিলেন, যদি তিনি আরো বেঁচে থাকতেন, এবং পরিস্থিতি খারাপও হয়ে দাঁড়াত, তাহলে হয়ত তলোয়ার এসে তার এই চাবুকের স্থান দখল করত।

যীশু সম্বন্ধে যে যাই বলুক না কেন, তিনি নিজেই বলেছিলেন যে তিনি শান্তি আনেন নি, এনেছেন তলোয়ার। তিনি হয়ত এটাকে তখন রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু তিনি যদি কোন সময় তাঁর নিজেকে ও তাঁর প্রেমের ধর্মমতকে রক্ষার জন্য জীবন-মরণ সংগ্রামে রত হতে বাধ্য হতেন, তবে তাঁর এই রূপক তলোয়ারই হয়ত বাস্তব ইস্পাতের তলোয়ারে পরিণত হত। তাঁর জীবদ্দশায় তার বিশ্বাসকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করতে অথবা তাঁর মতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করতে কখন কোন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নি। পরবর্তীকালে খৃস্টান

www.pathagar.com

ধর্ম যখন জাগতিক শক্তির অধিকারী হতে সমর্থ হয়েছিল, তখন কতটুকু তলোয়ার এরা ব্যবহার করেছিল ইতিহাস এর সাক্ষী।

যীশুর শিক্ষা থেকে এ সমর্থন করা হয়েছিল এবং ঐ সমস্ত বড় বড় ধর্মাধ্যক্ষরা, যারা নিজেদেরকে প্রেম ও সত্যের উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন, তারা এতে সম্মতি দিয়েছিলেন। তাদেরকে মনে করা হত যে তাঁরা ন্যায্য যুদ্ধ চালাতে এবং ধর্মীয় বিচারালয় স্থাপন করতে তাঁর (যীশু) দ্বারা অথবা "মহান আত্মা" কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এমন কি এখন, অনেক খৃস্টান, ধর্মীয়দল এবং ব্যক্তিগতভাবে বহু খৃস্টান সমস্ত প্রকার যুদ্ধকে খারাপ মনে করে। কারণ এ যীশুর শিক্ষার পরিপন্থী। গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাদের কিছুসংখ্যককে কারাগারে পাঠাতে হয়েছিল। তাঁরা নিজেদেরকে "বিবেকশীল আপত্তিকারী" বলে অভিহিত করেন।

ইসলাম যুদ্ধ সম্পর্কে একটা যৌক্তিক মতবাদ প্রচার ও অনুশীলন করে। পরবর্তীকালে মুসলমান শাসকদের পরিচালিত অধিকাংশ যুদ্ধই ছিল অনৈসলামিক যুদ্ধ। কেবলমাত্র ঐ যুদ্ধগুলোই ছিল ইসলামী, যেগুলো রসুলুল্লাহ্ ও তার সাহাবারা ইসলামকে নিরাপদ করতে ও ধর্মীয় নিপীড়ণকে ঠাণ্ডা করতে ঘোষণা করেছিলেন। মানবজীবনের মর্যাদা ইসলামের একটা মৌলিক বিষয় এবং কেবলমাত্র মানবজীবন ও তাঁর পরম মূল্যগুলোকে ন্যায়সঙ্গতভাবে রক্ষা করার জন্যেই যুদ্ধের অনুমোদন দেওয়া হয়। কুরআনে মানবজীবনকে সম্মান করতে ও রক্ষা করতে বহু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মানবজীবনের মর্যাদার বিষয় প্রচার করতে গিয়ে মানবজাতির সামাজিক সংহতিকেও টেনে আনা হয়েছে, এবং "এইজন্য আমরা (আল্লাহ্) ইসরাইলীয়দের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলাম যে নরহত্যা বা দেশের ক্ষতি করা ছাড়া অন্য কোন কারণে যে কেউ কোন লোককে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মানবজাতিকে হত্যা করল, এবং যে কেউ তাকে জীবিত রাখে সে যেন সমস্ত মানবজাতিকে জীবিত রাখল" (আল-কুরআন ৫:৩২)। আবার, অবৈধভাবে মানুষের জীবন

www.pathagar.com

নাশ করা সবচাইতে ঘৃন্য পাপ হিসেবে ব্যভিচারের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। সৎলোকেরা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না, যারাই এ করে, শাস্তি ভোগ করবে (আল-কুরআন ৩৫ : ৬৮)। প্রাক্-ইসলাম যুগে আরবরা তাদের নবজাত কন্যা সন্তানকে ব্যয় বহুল ও সামাজিক বোঝা মনে করে হত্যা করত। ইসলাম সর্বশক্তি দিয়ে এ প্রথার অবসান ঘটিয়েছিল ও সমস্ত মুসলিম জগত থেকে এর মূলোৎপাটন করেছিল। এ লজ্জাকর অপরাধ সভ্যজগতে আর কখন মাথা তুলেনি। কোন অযৌক্তিক প্রকৃতির বশবর্তী হয়ে যদি দু'জন লোক পরস্পর দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, এক্ষেত্রে নবী (সাঃ) বলেন যে, হত্যা-কারী ও নিহত উভয়েই দোযখে যাবে। নবী (সাঃ) যখনই মহাপাপের তালিকা দিতেন, তখন সব সময়ই হত্যা সে তালিকায় থাকত। "সব থেকে মহাপাপ হল আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক করা, নরহত্যা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যা কথা" (আনাস ইবন মালিক); "একজন মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্যায়ভাবে রক্তপাত করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে থাকে (ইবন উমর)।"

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, ইসলাম যখনই হত্যা নিষেধ করে, তখন সবসময়ই অন্যায় হত্যা বুঝায়। "তুমি হত্যা করবে না" এ কোন চরম আদেশ নয়। জীবনে এমন সব পরিস্থিতিও আসে যখন হত্যা করা একটা প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সেখানেই কোন অনিষ্টকারীকে হত্যার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, কুরআনে প্রায়ই সেখানে "ফিতনা" শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, ও বলা হয়েছে যে "ফিতনা" হত্যা থেকেও জঘন্য। এক কথায় "ফিতনা" শব্দটাকে অনুবাদ করা খুবই শক্ত। ফিতনা শব্দের অর্থ হল কোন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট বা প্রলোভনে ফেলা অথবা বিপদাপন্ন করা। এর আরো অর্থ হল উৎপীড়ণ করা, সামাজিক স্বেচ্ছাচারিতা, বা সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ও কোন মানুষকে অবৈধভাবে অনুগত হতে বাধ্য করা, অথবা অসত্যের অনুসন্ধানে মানুষকে প্ররোচিত

www.pathagar.com

করা, বা তাকে সত্য থেকে বিচ্যুত করা। কুরআনে এই শব্দটি প্রায়ই 'ফাসাদ' শব্দের সংগে একযোগে ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হল দুর্নীতি ও বিভেদ সৃষ্টি, যাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারিতা বুঝায়। ইসলামে হত্যা অনুমোদন করা হয়েছে শুধুমাত্র 'ফিতনা' ও 'ফাসাদ' দূর করতে, সামাজিক শৃঙ্খলা পুনঃ উৎপীড়ণ বন্ধ করতে এবং সন্ত্রাসের রাজত্বের পরিবর্তে আইনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে।

নবী (সাঃ) যে সব লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে ছিলেন তারা মানুষকে সমস্ত বিবেকের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছিল। উপাসনা ও রীতি-নীতির ব্যাপারে যারা তাদের সংগে ভিন্ন মত হত তারাই হত উৎপীড়িত, নির্বাসিত অথবা নিহত। বিজিতদের বদৌলতে নিজেদেরকে বিত্তবান করার জন্য মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হত না। সমস্ত মুসলিম আইন-বেত্তাগণই একমত যে শুধু কোন অর্থনৈতিক স্বার্থ কিংবা রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ করা অবৈধ। অন্যদেরকে জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য যুদ্ধও বৈধ নয়। মহান খলিফা উমরের একজন খৃস্টান গোলাম ছিল। প্রায়ই 'উমর তার সামনে ইসলামের সৌন্দর্য ও সত্যকে তুলে ধরতেন এবং তাকে মুসলমান হতে বলতেন। গোলাম সব সময়ই বলত, 'না, আমি তা করব না' তার অস্বীকৃতির উত্তরে উমর বলতেন, "তোমার পছন্দ, ইসলামে কোন জবরদস্তি নেই।" যেখানে তার নিজের চাকরের বেলায়ই তার কোন কিছু করবার ছিল না, সেখানে উমরের মত একজন লোক কি তার চারপাশের জাতিসমূহকে সংগীনের মুখে ধর্মান্তরিত করার জন্য যুদ্ধ চালাতে পারেন? নিরপেক্ষরা চিন্তা করুন।

মানবজাতির মহান ধর্মীয় পথ-প্রদর্শক হিসাবে যীশু-বুদ্ধের উদাহরণ তাদের কতক অনুসারী ও অন্যান্য কিছু সংখ্যক লোককে ধার্মিকতার সংগে সমস্ত যুদ্ধেরই নিষিদ্ধকরণকে এক করে দেখতে শিখিয়েছে। কিছুসংখ্যক খৃস্টান লেখক মত প্রকাশ করেছেন যে মুহম্মদ (সাঃ) একজন ভাল নবী ছিলেন

www.pathagar.com

কিছুদিন পর্যন্ত তিনি মক্কায় ধর্ম প্রচার করেন ও নির্যাতন ভোগ করেন। কিন্তু যখন তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং একটা রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি একজন রাজনীতিবিদ ও আইন-বেত্তায় পরিণত হন এবং সেজন্যে তিনি আর তখন নবী থাকেন না। নবুয়তের এ একটা অত্যন্ত সংকীর্ণ ধারণা যে একজন নবী ততক্ষণ পর্যন্তই নবী যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি শুধু প্রেম, ন্যায় ও সত্যের কথা বলেন ; কিন্তু মুহূর্তে তিনি সৃষ্টির নিম্নতর স্তরে নেমে আসেন, যে মুহূর্তে তিনি বাস্তবের সংস্পর্শে আসেন এবং তার প্রচারিত আদর্শ অনুযায়ী সমস্ত অকেজো ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করেন।

উচচ আদর্শ প্রচার করা যে কত সহজ এবং ব্যক্তিগত সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মাঝে অনুশীলন করা যে কত কঠিন তা প্রত্যেকেরই জানা। আদর্শকে যদি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভার ও পীড়নের পরীক্ষায় ফেলা না হয়, তবে এরা মাঝপথে লট্‌কে থাকে এবং তাদেরকে পরিপূর্ণতা ও অবাস্তব ধর্মীয় স্বপ্ন বলে মনে করা হয়। মুহম্মদ (সাঃ), যাঁকে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা এর একজন লেখক ইতিহাসের সবচাইতে সার্থক নবী বলে অভিহিত করেছেন, তিনি মানবজাতির সামনে বাস্তবে পরিণত করার যোগ্য বহু আদর্শ উপস্থাপন করেছেন। তিনি এগুলোকে তাঁর কালেই এমন এক পর্যায় পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত করেছিলেন যে তিনি তৃপ্তির সংগে বলতে পেরেছিলেন, "আমি আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছি।" ধর্মীয় সহিষ্ণুতা দমন করার ও ধর্মের দরজা সকলের জন্যে খুলে দেওয়ার পর তিনি তাঁর তলোয়ার কোষবদ্ধ করে ফেলেছিলেন। কুরআনে বার বার বলা হয়েছে : "এবং তাদের সংগে যুদ্ধ কর যত সময় পর্যন্ত না কোন নির্যাতন না থাকে, এবং ধর্ম হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তখন অত্যাচারী ছাড়া (আর কারও সঙ্গে) বিরোধ থাকবেনা" (আল্‌-কুরআন ২,১৯৩)। যে প্রভুর শান্তি গ্রহণ করে, তার ধর্ম যাই হোক না কেন সে তোমার

www.pathagar.com

আশ্রয়ে। তার জীবন, সম্মান ও সম্পত্তি রক্ষা কর যেমন তুমি তোমার নিজেরটাও করবে।

যদি আমরা ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, কোন ধর্ম বা কোন কৃষ্টিই মানবসমাজ থেকে যুদ্ধকে কখন মুছে ফেলে দিতে পারেনি। খৃস্টান ধর্ম, বুদ্ধ ধর্ম ও হিন্দুদের বৈদান্তিক ধর্মের মত ধর্মকে তাদের মতবাদগুলোকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে, যাতে এগুলো বাস্তবের সাথে খাপ খায়। সম্ভবতঃ মানবজাতির অন্য যে কোন দল থেকে খৃস্টান জাতিগুলো তাদের নিজেদের মধ্যে অথবা অ-খৃস্টানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী যুদ্ধ করেছে। ধর্মীয় উৎপীড়ণ এবং অসহিষ্ণুতার কথা বলতে গেলে অন্য কোন জাতি কখন এ ব্যাপারে খৃস্টানদের উপরে উঠতে পারে না। খৃস্টান লেখকরা তাদের গভীর কুসংস্কার বৈকল্যের জন্যেই ইসলামের বিরুদ্ধে অনবরত কুৎসা রটনা করেছে যে এ হল তরবারীর ধর্ম এবং মুসলমান ধর্মান্ধ সম্প্রদায় একহাতে তলোয়ার ও অপরহাতে কুরআন নিয়ে বাকী দুনিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল। এই অভিযোগ হয় ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা, অথবা নিছক বিদ্বেষের ফল।

ইসলামের উত্থান, তার আত্মসংরক্ষণ এবং সাধারণ মানবীয় স্বাধীনতা ও শালীনতা সংরক্ষণের ইতিহাসকে একটি বিশেষ মতবাদের প্রচারের জন্যে জোরজবরদস্ত প্রয়োগ বলে অপব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। শুরুতে ইসলাম ঐ সমস্ত আরব গোত্র ও ইহুদী, যারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদের সংগে শান্তির চুক্তি সম্পাদন করেছিল। কুরআন সবসময় চুক্তি ও সন্ধি পালন করার উপর খুব বেশী জোর দেয়। কিন্তু যখন আরবীয় গোত্রগুলো বার বার সন্ধি ভঙ্গ করতে ও ক্রমবর্ধমান ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যে একে অন্যের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগল, তখন ইসলামের পক্ষে মাত্র দুটো বিকল্প ব্যবস্থা ছিল: তাদেরকে ধ্বংস করা অথবা নিজেরা ধ্বংস হয়ে যাওয়া। যারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা এমন একটা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে

www.pathagar.com

আবদ্ধ হওয়া, শ্রেণী গোত্র নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিককে পূর্ণ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা দিয়েছিল। প্রজাতন্ত্রের সভাপতি (রাষ্ট্রনায়ক) যিনি সবার উপরে, তার যে অধিকার ছিল, সমাজের সর্ব-নিম্নস্তরের সর্বনিম্নজনেরও সেই একই অধিকার ছিল।

কিছু সংখ্যক লোক ইসলামকে একটা সামাজিক ও রাজ-নৈতিক আন্দোলন হিসেবে দেখেন, ধর্ম হিসেবে নয়। এমন কি এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেও যে কেউ একজন ইতিহাসের ছাত্রকে মানবজাতির ইতিহাস ঘেটে ইসলামের আগের যে কোন আন্দোলন আবিষ্কার করার জন্যে বলতে পারেন যা সামাজিক শ্রেণী বিভেদ সমূলে বিনষ্ট করেছে ও অন্যান্যদেরকে দাসত্বের বদলে পূর্ণ সাম্য প্রদান করেছে। বহু অভিজাত কুরাইশদের চেয়ে নিগ্রো বিলালকে তার চরিত্র ও ত্যাগের জন্যে উচ্চ গণ্য করা হত। কেউ হয়ত আপত্তি উত্থাপন করে বলতে পারেন, "হ্যাঁ, বুঝলাম, এ ছিল মুমিনদের একটা ভ্রাতৃত্ব, কিন্তু ঐ সমস্ত লোক যারা ইসলামের গণ্ডির বাইরে ছিল, তাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা?" এর উত্তর হল, ইসলাম তাদের জন্যে তাদের ধর্ম ও জীবন-পদ্ধতির পরিপূর্ণ রক্ষা ব্যবস্থা প্রদান করে, তারা ছিল একই আইনের অধীন। একদিক দিয়ে তাদের অবস্থা ছিল মুসলমানদের থেকে অনেক বেশী সুবিধাজনক, মুসলমানদের উপর যে সামরিক বাধ্য-বাধকতা ছিল, তা ছাড়াই তারা (অ-মুসলমানরা) রাষ্ট্রের তরফ থেকে সবরকমের রক্ষা ব্যবস্থা পেত। সামান্য একটা করের পরিবর্তে তাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান রক্ষার ভার রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হত। মুসলমানদেরকে তাদের উদ্বৃত্ত মূলধনের জন্যে একটা ভারী কর দিতে হত; কিন্তু অ-মুসলমানরা এ থেকে রেহাই পেত। দরিদ্র, উপার্জন করতে অক্ষম, বৃদ্ধ, অকর্মণ্য, নারী ও শিশু এবং অন্য ধর্মের পুরোহিতরা ছিল এর বাইরে; এবং যখনই কোন অমুসলমান এই সামান্য কর দিতে অক্ষমতা জানাত, তখন তাকে এ থেকে রেহাই দেওয়া হত। ইসলামকে ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ বলে গালি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের কোন সময়ে এমন কোন ধরণের সাম্রাজ্যবাদ ছিল

www.pathagar.com

না, যাতে শাসিতের চেয়ে শাসককে বেশী ভার বইতে বাধ্য করেছে। কিন্তু ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় মুসলমানরা অমুসলমানদের থেকে অনেক বেশী ভার বহন করেছে। প্রথম যুগের ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা আছে, যেখানে, যখন অমুসলমান গোত্রগুলো তাদের রক্ষা ব্যবস্থার জন্যে মুসলমানদেরকে কর দিত, এবং যখন মুসলমানরা দেখত যে তারা তাদেরকে তাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না, তখন তাদেরকে সেই কর ফেরত দেওয়া হয়েছে। জিজিয়া বলে কথিত এই করকে প্রভেদ-সূচক কর বলে মনে করা হয়েছে এবং এই বলে এ রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে একটা পার্থক্য সৃষ্টি করে, ভুল বুঝা হয়েছে। কিন্তু এই অভিযোগ ইসলামী শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কর যদি মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে প্রভেদ করেই থাকে, তাহলে এ রক্ষাকর্তা মুসলমানদেরকেই অসুবিধায় ফেলেছিল কারণ তারা উচ্চ কর দিতে বাধ্য ছিল ও তাদের উপর রাষ্ট্রের জন্যে যুদ্ধ করার দায়িত্বও ছিল। অমুসলমানদের জন্যে যুদ্ধ করার কাজ বাধ্যতামূলক ছিল না। যে অমুসলমানরা যুদ্ধে যোগদান করত তাদেরকে এই কর থেকে রেহাই দেওয়া হত।

কুরআন যখনই ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছে, তখন এ এমন কি স্বয়ং ইসলামের রক্ষা ব্যবস্থার আগেই অন্যান্য ধর্মের রক্ষা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে। শুধু মাত্র মুসলমান সমাজের রক্ষাই নয়, দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধের সমর্থনীয় কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। "এবং আল্লাহ্ যদি একদল লোককে অন্য একদল লোক দিয়ে শায়েস্তা না করাতেন, তাহলে পৃথিবী নিশ্চয়ই বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকত, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট জীবদের প্রতি করুণাময়" (আল-কুরআন ২:২৫১)। উপাসনা করার জায়গাগুলো রক্ষা করার যে আদেশ, তা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য এবং ইসলামের মর্ম ও তাঁর যুদ্ধ দর্শনের তাৎপর্য বুঝতে এর মূল্য অপরিসীম। "আল্লাহ্ যদি একদল লোককে আর একদল দিয়ে শায়েস্তা

www.pathagar.com

না করাতেন তাহলে আশ্রম, গির্জা, সিনাগগ ও মসজিদ, যেসব জায়গায় আল্লাহ্‌র নাম বহুলভাবে স্মরণ করা হয়, তা সব বিধ্বস্ত হয়ে যেত" (আল-কুরআন ২২:৪০)। মসজিদের কথা সকলের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, সকলের আগে নয়। যখনই বর্বর জাতি বা ধর্মোম্মাদ দল অন্য জাতিকে আক্রমণ করে, তখন সমস্ত ধর্মীয় স্বাধীনতা-ভক্ত লোকদের উচিত তার বিরুদ্ধে অবশ্য রুখে দাঁড়ানো ও যুদ্ধ করা, যাতে করে স্বাধীনভাবে উপাসনা করার ও বিবেকের স্বাধীনতার অধিকার রক্ষিত হয়, যার থেকে উদ্ভব হয় অন্যান্য বহু রকমের নাগরিক স্বাধীনতার।

ইসলামে যে কোন জাতির উপাসনার স্থানকে ধ্বংস করা কিংবা অপবিত্র করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কোন ধর্মের ধর্ম-যাজক হত্যা করা চলবে না অথবা কোন উপায়েই তাদেরকে হয়রান করা যাবে না। যদি কোন সময় কোন মুসলমান আক্রমণকারী এই আদেশের বিপরীত কাজ করে তাহলে তার অপরাধকে ইসলামের উপর বর্তান যায় না। কোন লোকের ত্রুটিকে, সে কেবল বাহ্যিকভাবে যে ধর্মের গণ্ডির মধ্যে সে ধর্মের কাঁধে চালিয়ে দেওয়া যায় না। তাদের ত্রুটি হলো তাদের অবিশ্বাসেরই ফল, তাদের বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ ফল নয়। মানব জাতির জন্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার কথা আল-কুরআন বহু জায়গায় স্বীকার করেছে। এর অর্থ হল যদি যেকোন সময়ে যেকোন জায়গায় স্বৈরতন্ত্র ও উৎপীড়ণ মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং তা বিশ্বের শান্তির প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দেয়, তখন এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্তব্য। মানবসমাজের ইতিহাসে যেসব যুদ্ধ ঘটেছে তা বিভিন্ন উদ্দেশ্য থেকে উদ্ভূত, হয় অর্থনৈতিক স্বার্থ, অথবা ক্রোধ ও প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির তাড়না অথবা অতিরিক্ত শক্তি গঠনমূলক সামাজিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে না পারায় তা ব্যয়ের জন্যে অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে লোক সংখ্যার তুলনায় জীবিকা অর্জনের পথ অপর্যাপ্ত হওয়ায় গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু একেবারে শুরু থেকেই

www.pathagar.com

এ পর্যন্ত অর্থনৈতিক স্বার্থ বা সাম্যবাদী অর্থনীতির মতে উৎপাদন ও বিলিব্যবস্থার উপায়, কখন মানবজাতিতে যুদ্ধের একমাত্র কারণ ছিল না। গোত্রের কোন লোককে অপমান করা বা হত্যা করা অথবা সে গোত্রের দেবতাকে অপমান করাই এমন যুদ্ধ বা শত্রুতা সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট ছিল, যা একটি সমগ্র শতাব্দি পর্যন্তও চলতে পারত। ইসলামের পূর্বের আরব গোত্রগুলোর ইতিহাসে আমরা এর ভূরি ভূরি উদাহরণ পাই। তারপর আমরা নাগরিক জীবনের সম্পদের লোভে অসভ্য জাতিদেরকে অভিযান চালাতে দেখি—নাগরিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ বা নৈতিক অধঃপতন ও সামাজিক স্বেচ্ছাচারিতার ফলে যারা ননীর পুতুলে পরিণত হয়।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও ধর্মোত্ততার কারণেও বহু প্রলয়ংকরী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে 'ক্রুসেড' সব চাইতে লজ্জাজনক উদাহরণ। ক্রুসেডকারীরা সমস্ত ইউরোপ তোলপাড় করেও যে মুসলিম সাম্রাজ্যকে তারা ধবংস ও পদানত করতে চেষ্টা করেছিল, তার চেয়ে, যেসব দেশ থেকে ও যেসব দেশের মধ্যে দিয়ে তারা এসেছিল সেসব দেশেই তারা বেশী বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের সৃষ্টি করেছিল। তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ রাজবংশের রক্ষা ও সম্মান বৃদ্ধির জন্যে বহু রাজ্য সম্পর্কিত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যেখানে রাজনীতির শক্তির খেলায় সমগ্র জাতিকে গুটিকয়েক শক্তিমদমত্ত শাসকের উচ্চাকাঙ্খার ফলে লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়েছে এবং অসংখ্য ঘরবাড়ী বিনষ্ট হয়েছে।

শিল্পবাদী পুঁজিবাদের উত্থানের ফলে ইতিহাসে নূতনভাবে যুদ্ধের সূচনা হয়। সস্তা কাঁচামাল যোগান পাওয়ার জন্যে ও পাকামাল বিক্রির জন্যে, শিল্পের দিক দিয়ে নিজেদের মধ্যে যাদের কোন সংগঠন ছিল না, এবং উৎপাদন ও ধংসের শক্তিশালী যন্ত্র আবিষ্কারে যারা পেছনে পড়ে ছিল, সেসব জাতিগুলোকে বশীভূত করা হয়েছিল। শিল্পবাদী পাশ্চাত্য দেশ তার স্বার্থে সমগ্র দুনিয়াকে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করতে মনস্থ করল। একই সংগে পাশ্চাত্য দেশে গোত্রীয়, ভাষাভিত্তিক ও আঞ্চলিক

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠে এবং পুঁজিবাদের স্বার্থে দেশপ্রেমের আগ্রহকে ব্যবহার করা হয়েছিল। শিল্পবাদী, পুঁজিবাদ ও জাতীয়তাবাদ তাদের নিজেদের দেহের মধ্যেই তাদের ধ্বংসের বীজ পোষণ করেছিল এবং এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ আমরা এখন দেখি যে দুনিয়া অর্থনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে গেছে, যা নৈতিক ও ধর্মীয় অনুভূতিকে বিবাদ বিসম্বাদের উদ্দেশ্যে কাজে লাগাচ্ছে। দুনিয়া এখন আর একটা প্রলয়ংকরী মহাযুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

যদি ধর্মকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকতেই হয় এবং মানবীয় মূল্যমানগুলোকে তার পোষণ ও সংরক্ষণ করতেই হয়, তাহলে এই পরিস্থিতিতে ইসলাম কি পথের সন্ধান দিতে পারে, তা আমাদেরকে দেখতে হবে। আমরা আগেই ইসলামের যুদ্ধ দর্শন কি তা দেখিয়েছি। ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দেয় এবং সামাজিক-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতেও সমস্ত অন্যায় অবিচারের মূল বিনষ্ট করতে যুদ্ধকে একটা কর্তব্য বলে নির্দেশ করে। ইসলাম মানবজাতিকে পরস্পর শত্রুতাভাবাপন্ন দল উপদলে বিভক্তকারী গোত্র বা উপজাতিতে বিশ্বাস করেনা। এ পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদেও বিশ্বাস করে না। গোত্র ও বিভিন্ন জাতি আছে ও থাকবে। কুরআন ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্রকে আল্লাহ্‌র অন্যতম রহমত বলে মনে করে। কিন্তু এই বলে জোর দেয় যে মানবজাতি মূলতঃ এক, "মানবসমাজ একই জাতি ছিল এবং আল্লাহ্‌ তাদেরকাছে সুসংবাদ বহনকারী ও সতর্ককারী হিসাবে নবীদেরকে পাঠান এবং তাদের কাছে সত্যসহ মহাগ্রন্থ নাযেল করেন, যাতে মানব সমাজ যেসব বিষয়ে মতবিরোধ পোষণ করে, সেসব বিষয়ে ফায়সালা করতে পারে" (আল-কুরআন ২,২১৩)। তাই ইসলাম গোত্রবাদ বা জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে। জাতিয় শক্তি বৃদ্ধির জন্যে যুদ্ধ করাও ইসলামী-নীতি অনুসারে চলতে পারে না।

কিছু লোক মনে করে যে ইসলাম কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা-মূলক যুদ্ধেরই অনুমতি দিয়েছে। এর অর্থ যদি এই হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাস্তবিক আক্রান্ত হওয়া যায় ততক্ষণ

www.pathagar.com

পর্যন্ত অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে, তাহলে এটা ইসলামের মৌলিক নীতির একটা অপব্যাখ্যা বই নয়। মৌলিক মানবীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যুদ্ধ চালাতেই হবে। যেমন কুরআন বলে, "যতক্ষণ পর্যন্ত না উৎপীড়ণ বন্ধ হয় এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাও" (আল-কুরআন ২,১৯৩)। যদি কোন শত্রুকে স্বাধীনতা নষ্ট করার জন্যে তৈরী হতে দেখা যায়, তাহলে সে বেশী শক্তিশালী হওয়ার আগেই তাকে অবশ্য ধ্বংস করতে হবে। ইসলাম মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষার জন্যে তার অনুসারীদের প্রস্তুত থাকতে আদেশ দেয়। কিন্তু বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি রক্ষার জন্যে সবরকমের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যতদিন পর্যন্ত মানব-জাতি একে অন্যের উপর হামলা করার জন্যে পরস্পর যুদ্ধংদেহী দলে বিভক্ত থাকবে ততদিন যুদ্ধ অনিবার্য ও সবসময়ই আক্র-মণের সম্ভাবনা থাকবে।

এটা জাতিসংঘের নীতি ও কুরআনে বিবৃত হয়েছে। সমস্ত জাতিকেই এক মানবজাতিরূপ দেহের অঙ্গ হিসাবে শান্তি-পূর্ণভাবে বাস করতে হবে, প্রত্যেককেই তার নিজস্ব জীবন পথ অনুসরণ করতে দিতে হবে। এমন কি নৈতিক বা বুদ্ধিগত ভাবে শ্রেষ্ঠ কোন জাতির জোর করে আর নিজস্ব জীবন-পদ্ধতি অন্য জাতির ঘাড়ে চাপাবার অধিকার নেই। প্রাচীনকালে পৃথিবীতে জীবন ছিল সামগ্রিক ধর্মের অধীন এবং কুরআন যখন এই নীতি ঘোষণা করে যে ধর্মের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধ-কতা থাকতে পারবে না, তখন একথা বলারই নামান্তর যে ব্যক্তি ও জাতিকে ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই তাদের নিজেদের জীবন পথ অনুসরণ করার স্বাধীনতা দিতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নিপীড়ণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানব-সমাজের সমস্ত বিভিন্ন দলের জন্যেই একটা মুক্তির সনদ, যা রাজা 'জন' এর 'মহান সনদ' (ম্যাগনা কার্টা) বা এমন কি সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পাদিত 'অতলান্তিক সনদ' (আটলান্টিক চার্টার) থেকে অধিকতর ব্যাপক।

www.pathagar.com

ইসলামের মতে প্রত্যেক সভ্য জাতিরই যুদ্ধ ও শান্তির নীতি হিসেবে এ গ্রহণ করা উচিত যে যখনই কোন অসহায় ও দুর্বল উৎপীড়িত হয়, তখনই সৎ-ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তিদের অবশ্য কর্তব্য এই যে তারা অত্যাচারীকে ধ্বংস করার জন্যে রুখে দাঁড়াবে। ইসলামে প্রভুর পথে যুদ্ধ করার অর্থ সামাজিক ন্যায়-বিচারের জন্যে যুদ্ধ করা। এর অর্থ কোন বিশেষ ধর্মবিশ্বাস প্রচারের জন্যে যুদ্ধ নয়। মহাগ্রন্থের (কুরআনের) অসংখ্য জায়গায় বলা হয়েছে যে অত্যাচার ও স্বাধীনতা দলনের বিরুদ্ধাচারণ করতে হবে এবং যুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ না উৎপীড়ণ বন্ধ হয় এবং লোকেরা নিজেদের পছন্দ মত ধর্ম পথ বেচে নিতে পারে ও সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারে, এবং "তোমাদের স্বপক্ষে কি যুক্তি আছে যে তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করবে না এবং পুরুষ ও নারীদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের জন্যে এবং তাদের শিশুদের জন্যে যারা বলে, "হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে এই শহর, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী, তার থেকে পরিত্রাণ করে নাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে একজন সাহায্যকারী দাও" (আল-কুরআন ৪,৭৫)। প্রভুর পথে যুদ্ধ করার অর্থ কি এখানে পরিষ্কারভাবে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোন ধর্মীয় তত্ত্বকথা অথবা তত্ত্ববিদ্যা সংক্রান্ত কোন মতবাদের জন্যে এ যুদ্ধ নয়; আল্লাহ্‌ হলেন মানবীয় আচরণের আদর্শ; তিনি সামাজিক ন্যায়-বিচারের প্রতিভূ। সামাজিক ন্যায়-বিচারের জন্যে যুদ্ধই কেবল ইসলামে স্বীকৃত হয়েছে; অন্য কোন উদ্দেশ্যে যুদ্ধ হবে অনৈসলামী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা